শিশু-কিশোর গল্প

গল্প-সল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১

যদু যেমন ষণ্ডা ছিল, সে খেতেও পারত তেমনি। যখন সে খুব ছোট সে খুব ছিল, একদিন সে গেল এক বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে। ভারি ভারি খাইয়ে সব সেখানে খেতে বসেছে, লুচি কোরমার ধুম লেগে গেছে। খাইয়েরা খুব খেতে পারাটাকে বড়ই বাহাদুরি মনে করে। তাই খাওয়া শেষে হবার সময় তারা বললে, 'আচ্ছা, আজ কে সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে?' এ কথায় কেউ বলছে, 'আমি!' আর কেই বলছে, 'না আমি! ত শুনে যারা পরিবেশেন করছিল তাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে না; সকলের চেয়ে বেশি খেয়েছে এ ছেলেটি (মানে, যদু)।' সে 'এতগুলো' লুচি আর 'এত টুকরো' কোরমা খেয়েছে।

সকলে তাতে ভারি আশ্চর্য হয়ে যদুকে জিজ্ঞেসা করল, 'হ্যাঁ রে, সত্যি নাকি তুই এত খেয়েছিস?' যদু বলল, 'খেয়েছি বৈকি। আরো খেতে পারি!' তা শুনে সবাই বলল, 'বটে? আচ্ছা আন্ দেখি লুচি কোরমা, দেখি ও আর কত খেতে পারে।' শুনেছি তখন নাকি যদু আরো এক দিস্তা (চব্বিশখানা) লুচি আর আঠার টকুরো কোরমা খেয়েছিল। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন, আমার তখন জন্ম হয় নি। এত খেয়েও যে যদুর পেট ভার হয়েছিল তা মনে করো না। সে তখনি সুপারির ডালের ঘোড়া হাঁকিয়ে বাড়ি এল, এসে কালোজাম গাছে উঠে আরো অনেকগুলো কালোজাম খেল।

২

এ হল বহুকালের কথা। তখন 'খাইয়ে' বললে ভারি একটা গৌরবের কথা হত। সে সময় এক ব্রাহ্মণ এই বাহাদুরির লোভে মারাই গিয়াছিলেন। কোন বড়লোকের বাড়িতে তাঁকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করে, তাঁর যা ইচ্ছা, যত খুশি খেতে দেওয়া হত। একদিন সেখানে খেতে বসে বললেন, 'আজ আমি শুধু ছানা আর চিনি খাব।' তাই তাকে এনে দেওয়া হল। তিনি তখন সাতসের ছানা চেঁছেপুছে শেষ করে, বিস্তর বাহদুরি পেয়ে, বাড়ি এসে সেই রাত্রেই পেট ফেঁপে মরা গেলেন।

আর-একটি ভটচাজ্জি মশায়েরও বিষয়ে খুব নাম ছিল। সকলে যখন তাঁর খাওয়া দেখে আশ্চর্য হত, তখন তিনি নিজের কপালে টোকা দিয়ে বলতেন, ‘দেখছ কি? এই টুকু নিরেট, আর সব পেট।’

৩

একটি ছেলের মনটি বড় ভাল, কিন্তু স্বভাবটি একটু পাগলাটে গোছের। সে একদিন রাত্রে এক জায়গায় গিয়েছিল-পূজা দেখতে। ঢুকবার সময় তার বুট জোড়াটি বাইরে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে, কে তা নিয়ে গেছে। ছেলেটি ত তাতে হেসেই অস্থির। সে বলল, “বেটা ভারি ঠকেছে, পুরনো জুতো চুরি করেছে, দু মাসও পায়ে দিতে পারবে না।” যা হোক এখন বাড়ি ফিরে ত যেতে হবে, কাজেই শুধু পায়ে হেঁটে, ট্রাম ধরবার জন্য হেদোর ধারে এসে উপস্থিত হল। সেখান থেকে তার বাড়ি পঁচিশ মিনিটের পথ-পটলডাঙ্গায়। সে হেদোয় এসেই ট্রাম পেয়েছিল, কিন্তু তখন সে ভাবল, এখান থেকে উঠে কেন নাহক ঠকি! সেই ছ’পয়সাই ত দিতে হবে,-আমি শ্যামবাজারে গিয়ে ট্রাম ধরে পয়সা আদায় করে নেব। বলে সে ত সেই শুধু পায়ে হেঁটে হেঁটে গিয়ে শ্যামবাজারে আড্ডায় উপস্থিত হয়েছে। সেখানে দিয়ে সে শুনল যে সেদিন আর ট্রাম পাওয়া যাবে না। হেদোর ধারে যেখানা সে পেয়েছিল, সেই ছিল শেষ গাড়ি! সেদিন সে বাড়ি ফিরে এলে পর তার হাসির চোটে বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

৪

বাংলা অক্ষরে, যেমন অন্য-সব ভাষায় সকল কথা লেখা যায়-যেমন ‘আই গো আপ’, কিংবা কোন নাম যেমন ‘লর্ড কারমাইকেল’, ‘জেমস ওয়াট’, সেরকম কিন্তু সব ভাষায় চলে না। চীনা ভাষায় এক একটি অক্ষরের এক একটি কথা। একজন বাঙালি বাবু একজন চীনা ভদ্রলোককে বললেন, ‘আপনি আপনাদের ভাষার অক্ষরে আমার নাম লিখুন ত। আমার নাম ‘ধ্রুব’। চীনা ভদ্রলোকটি অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে কতকগুলি হিজিবিজি কি যেন লিখলেন। সেই লেখা অন্য একজন চীনা ভদ্রলোককে পড়তে দেওয়া হল। সে বলল, ‘এতে লেখা রয়েছে- দু-লুফা।’ একজন জাপানী

ভদ্রলোক ট্রাফালগারের সম্বন্ধে জাপানীভাষায় কি যেন লিখছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যে যেখানে ট্রাফালগার কথাটা আছে, সেটা তিনি ইংরেজীতেই লিখছিলেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ও কথাটা ইংরেজীতে লিখলেন যে?' জাপানী ভদ্রলোক বললেন, 'আমাদের ভাষার অক্ষর দিয়ে ট্রাফালগার লেখা যায় না, সবচেয়ে কাছাকাছি যা লেখা যায়, তার উচ্চারণ হচ্ছে- ত্রা-ফারু-গারু'।

৫

এক সাহেবের বড় বাংলা শেখবার শখ হল। তিনি এক পণ্ডিত রেখে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলেন। গোড়ায় কয়েকদিন বেশ উৎসাহের সঙ্গে পড়া চলল; কিন্তু যখন যুক্ত অক্ষর পড়া আরম্ভ হল, তখনি ত সাহেবের যত গোল বাধল। তিনি যুক্ত অক্ষর দেখে ত চটেই অস্থির, 'কি! একটা অক্ষরের ঘাড়ে আর একটা অক্ষর। এমন আজগুবি ভাষাও ত দেখি নি। এমন ভাষাও আবার ভদ্রলোকে পড়ে! মানুষের ঘাড়ে মানুষ, আর অক্ষরের ঘাড়ে অক্ষর, এ কেবল তোমাদের দেশেই সম্ভব।

৬

এক চাষার একটু বুদ্ধি কম ছিল। চাষা মাঠে যাবে কাজ-করতে, সারাদিন ত সেখানে থাকতে হবে, তাই তার স্ত্রী বিকালে জলখাবারের জন্য তার কাপড়ে দশখানা চাপাটি বেঁধে দিল। চাষা ভারি পেটুক ছিল। সে মাঠে যেতে না যেতেই ভাবল, 'উঃ! আমার দেখছি, এক্ষুনি বড্ড খিদে পেয়েছে, চাপাটি খাব নাকি! না, তা হলে বিকালে খাব কি?'

খানিক বাদে সে ভাবল, 'উঃ। বড্ড খিদে পেয়েছে, একখানা চাপাটি খাই, বাকি বিকালে খাব।' ভাবল 'আর একখানা খাই।' যত খায়, ততই তার খিদে যেন বেড়ে যায়। একখানা দুখানা করে সে আটখানা খেয়ে ফেলল, তবুও তার পেট ভরল না। শেষে বাকি দুখানও বার করে খেতে হল, তার তাতে তার পেটও ভরে গেল।

তখন চাষা ভাবল, ‘আটটা খেলাম, তাতে কিছু হল না, আর এ দুটো খেতে না খেতেই পেট ভরে গেল। আহা! এ দুখানা কেন আগে খেলুম না, ত হলে ত গোড়াতেই পেট ভরত, আর আমার কোঁড়ে আটখানা চাপাটি থেকে যেত। তাইত, আমি কি বোকা!’

৭

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভোজ হচ্ছে। একদল গুলিখোর তাই শুনে সেখানে নিমন্ত্রণ খেতে চলল। যেতে যেতে তাদের একজন বলল, ‘আরে, তোরা যে যাবি, ফটক শুনেছি বড্ড নিচু-ঢুকবি কি করে?’

তা শুনে আরেকজন বলল, ‘কেন? এমনি করে ঢুকব!’ বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। তা দেখে আর সবকটাও তেমনি করে হামাগুড়ি দিতে লাগল।

এইভাবে ত তারা গিয়ে ভোজের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে, আর অমনি যমদূতের মতন চারটে দারোয়ান এসে তাদের ঘাড়ে চেপে ধরেছে। তখন সেই প্রথম গুলিখোরটা ভারি গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় বলল, ‘এখন দেখ্ দেখিনি? আমি বলেই ছিলাম, যে, ফটক নিচু, আটকাবে!’

৮

একটি মাসে দশটি টাকার কমে একটি স্কুলের ছেলের খাওয়া চলে না। আমাদের ছেলেবেলায় আমার চাকরকে দু’পয়সা করে দিয়েছি। তাতেই সে আমাদের দুবেলা খেতে দিয়েছে। আমি কিন্তু হিসাব-কিতাবের কথা বলতে যাচ্ছি না, আমি সেই চাকরটির কথা বলছি। তার নাম-আমরা তার সাক্ষাতে বলতাম ‘কালী’, অসাক্ষাতে বলতাম ‘কেলে’। দুপয়সায় দুবেলা মাছ, তরকারি, ডাল, ভাত পেট ভরে খেতে দিতে হবে। কেলে তা ত দিতই, আবার তার উপরে ঢের লাভ করে নিতেও ছাড়ত না। তার লাভের চোটে আমাদের পেট চোঁ চোঁ করত।

বাজারে যতরকমেরই মাছ উঠুক, কেলে আনে শুধু বাটা। ছ-আঙুল লম্বা একটি মাছ, তাকেই দুভাগ করে একজনকে দেয় ল্যাজা, আর-একজনকে দেয় মুড়ো। যে ল্যাজা পায়, তার তবু দুগ্রাস খাওয়া চলে। কিন্তু যে মুড়া পায়, সে বেচারার খালি চোষাই সব।

মাছ পাতে পড়তেই ছেলেরা একজন আর একজনকে ডেকে খবর নেয়, কার ভাগে কি জুটেছে, কিন্তু সে কথা কেউ বাংলাতে বলতে ভরসা পায়না। কেলের মেজাজটা বেজায় বেয়াড়া আর মুখটা অতি অসভ্য। ছেলেরা তাই ইংরেজীতে বলে 'কি হে, হেড না টেইল?' একদিন একজনের পাতে পড়েছে 'ল্যাজা, সে ভুলে বলে ফেলেছে 'হেড'। অমনি কেলে বিষম দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কি? তোমাকে দিলাম টেইল, আর তুমি যে বললে হেড?'

সেদিন খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেরা ঘরে এসে বলতে লাগল, 'নাঃ, বেটাকে জব্দ করতে না পারলে আর চলছে না। ইংরেজিতে কথা বলব, তাও দুদিন শুনেই বুঝে নেবে, একি সহ্য হয়?' তখন এই যুক্তি হল যে, তরকারি যতই কম হোক, সবাই মিলে কষে ভাত খেয়ে কেলেকে নাকাল করবে।

বারজনের রান্না হয়, সেদিন রাত্রে পাঁচজনেই তার সব চেঁছেপুছে খেয়ে বসে আছে, আবার বলছে 'আরও দাও'! হাড়ি পানে চেয়ে কেলের মুখ শুকিয়ে গেছে, কিন্তু আর উপায় কি? পেট ভরে খেতে দিতেই হবে। সে বেলার কাজ শেষে দই চিড়ে এনে চালাতে হয়েছিল। কাজেই লাভ যা হয়েছিল, তা উলটা বাগে।

তার পরদিন কেলে আগে ভাগেই সাবধান হয়ে ঢের বেশি ভাত রেঁধেছিল। কিন্তু সবাই বললে, 'আজ আমাদের খিদে নেই।' কাজেই কেলের অনেক ভাত লোকসান হল। এমনি ভাবে দিন তিনেক যেতেই কেলে বেশ বুঝতে পারল যে ছেলেদের খুশি না রাখতে পারলে লাভের অংশ খুবই কম। তারপর থেকেই দেখা গেল কেলের মেজাজটিও একটু নরম, কথাবার্তাও কতকটা ভাল।